কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২৯

সূরা বনী ইসরাঈল (৩১-৪০)

وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿۳۱﴾

৩১. আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

আলোচ্য আয়াতে এই নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা অবশ্যই বড় কিন্তু তারপর কি? তিনি বললেন, এবং তোমার সাথে খাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা”। [বুখারীঃ ৪৪৭৭]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ| তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছে?

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿۳۲﴾

৩২. আর যিনার ধারে-কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

“যিনার কাছেও যেয়ে না” এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। আয়াতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরাম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। কিন্তু যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সামান্যতম অংশও বাকী আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলে তারা ব্যভিচারকে অন্যায় বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। এটা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা তার দিকে তেড়ে এসে ধমক দিল এবং চুপ করতে বলল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, বস। যুবকটি বসলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তেমনিভাবে মানুষও তাদের মায়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ অনুরূপভাবে মানুষ তাদের মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করে না। তারপর রাসূল বললেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য সেটা পছন্দ কর? যুবক উত্তর করলঃ আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন, আল্লাহর শপথ, তা কখনো পছন্দ করি না। তখন রাসূল বললেনঃ তদ্রুপ লোকেরাও তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না। (এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফুফু, ও খালা সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বললেন আর যুবকটি একই উত্তর দিল) এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহ! তার গুনাহ। ক্ষমা করে দিন, তার মনকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন।” বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, এরপর এ যুবককে কারো প্রতি তাকাতে দেখা যেত না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৫৬, ২৫৭]

দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে। এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। [মুসলিমঃ ৫৭]

وَ لَا تَقۡتُلُوا النَّفۡسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالۡحَقِّ ؕ وَ مَنۡ قُتِلَ مَظۡلُوۡمًا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِیِّهٖ سُلۡطٰنًا فَلَا یُسۡرِفۡ فِّی الۡقَتۡلِ ؕ
اِنَّهٗ کَانَ مَنۡصُوۡرًا ﴿۳۳﴾

৩৩. আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না! কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমরা তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা আরেক নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লঘু অপরাধ। [তিরমিযীঃ ১৩৯৫, ইবনে মাজহঃ ২৬১৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ প্রত্যেক গোনাহ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-শুনে

ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে না। [নাসায়ীঃ ৭/৮১] সুতরাং কোন মু'মিনকে হত্যা করা অন্যায়। শুধুমাত্র তিনটি কারণে অন্যায় হত্যা ন্যায়ে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে মুসলিম আল্লাহ একমাত্র সত্যিকার মাবুদ এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীআতসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা। [মুসলিমঃ ১৬৭৬] এ তিনটি শাস্তির দাবী করার অধিকার প্রতিটি মুমিনের তবে এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতা কেউ যেন নিজ হাতে নিয়ে না নেয়। বরং একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে।

দাহহাক বলেন, এটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা তখন মক্কায় ছিল। এটি হত্যা সংক্রান্ত নাযিল হওয়া প্রথম আয়াত। তখন মুসলিমদেরকে কাফেররা গোপনে বা প্রকাশ্যে হত্যা করছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মুশরিকদের কেউ তোমাদের হত্যা করছে বলে তোমরা তাদের পিতা, ভাই, অথবা তাদের গোত্রীয় কাউকে হত্যা করো না। যদিও তারা মুশরিক হয়। তোমাদের হত্যাকারী ছাড়া কাউকে হত্যা করো না। [ফাতহুল কাদীর]

...جَعَلۡنَا لِوَلِیِّهٖ سُلۡطٰنًا.মূল শব্দ হচ্ছে, "তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছি।" এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে "প্রমাণ" যার ভিত্তিতে সে হত্যাকারীর উপর কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মোকদ্দমায় নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে। [ইবন কাসীর] তবে যদি মূল অভিভাবক না থাকে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারে। [ফাতহুল কাদীর]

হত্যা ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে.. এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই নিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তের মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা। অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের উপর মনের ঝাল মেটানো অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীআতের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার সাহায্যকারী হবেন। পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উম্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মযলুম না হয়ে যালেম হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে যুলুম থেকে বাঁচাবে।

যায়েদ ইবন আসলাম এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গীসাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধ সম্পূহায় উম্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না, বরং

তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। আয়াতে মুসলিমদেরকে এ রকম কিছু না করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

وَ لَا تَقۡرَبُوۡا مَالَ الۡیَتِیۡمِ اِلَّا بِالَّتِیۡ هِیَ اَحۡسَنُ حَتّٰی یَبۡلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوۡفُوۡا بِالۡعَهۡدِ ۚ اِنَّ الۡعَهۡدَ کَانَ مَسۡـُٔوۡلًا ﴿۳۴﴾

৩৪. আর ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তার সম্পত্তির ধারে-কাছেও যেও না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

অবৈধভাবে কারো জান নষ্ট করতে নিষেধ করার পর এখানে মাল নষ্ট করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আর ইয়াতীমের মালের ব্যাপারটা যেহেতু বেশী গুরুতত্ত্বপূর্ণ তাই বললেন, ইয়াতীমের সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার মালকে এমন কাজে লাগাও যাতে তার লাভ হয়। চিন্তা-ভাবনা না করেই এমন ব্যবসায় লাগিয়ে দিও না, যাতে তা (মাল) নষ্ট হয়ে যায় অথবা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিংবা সাবালক হওয়ার পূর্বেই তার মাল নিঃশেষ হয়ে যায়।

‘প্রতিশ্রুতি’ বা অঙ্গীকার বলতে সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে রয়েছে এবং সেই অঙ্গীকারও যা বান্দাগণ আপোসে একে অপরের সাথে করে থাকে। উভয় অঙ্গীকার পূরণ করা জরুরী। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে কাল কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হতে হবে এবং সে ব্যাপারে কৈফিয়ত দিতে হবে।

وَ اَوۡفُوا الۡکَیۡلَ اِذَا کِلۡتُمۡ وَ زِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِیۡمِ ؕ ذٰلِکَ خَیۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِیۡلًا ﴿۳۵﴾

৩৫. আর মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দাও এবং ওজন কর সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ দুনিয়াতে এটি উত্তম হওয়া যুক্তি ও বিবেকের দাবী। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে আখেরাতের পরিণতি তথা সওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার উত্তম পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই এর পরিণতি শুভ।

দুনিয়ায় এর শুভ পরিণামের কারণ হচ্ছে এই যে, এর ফলে পারস্পরিক আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন দু’জনের উপর ভরসা করে, এর ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি আসে এবং ব্যাপক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। অন্যদিকে আখেরাতে এর শুভ পরিণাম পুরোপুরি নির্ভর করে ঈমান ও আল্লাহ ভীতির উপর।

وَ لَا تَقۡفُ مَا لَیۡسَ لَکَ بِهٖ عِلۡمٌ ؕ اِنَّ السَّمۡعَ وَ الۡبَصَرَ وَ الۡفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا ﴿۳۶﴾

৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

আয়াতে উল্লেখিত (وَلَا تَقْفُ) শব্দটির সঠিক অর্থ, পিছু নেয়া, অনুসরণ করা। সে অনুসারে আয়াতের অর্থ হবে যে বিষয়ে তুমি জাননা সে বিষয়ের পিছু নিওনা। ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, বলো না। অপর বর্ণনায় তিনি বলেছেন, যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কাউকে অভিযুক্ত করো না। কাতাদাহ বলেন, যা দেখনি তা বলো না। মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া বলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। মোটকথা: যে বিষয় জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলাকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সবচেয়ে বড় গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা—যার কোন সনদ তিনি পাঠাননি, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।” [আল-আরাফঃ ৩৩] অনুরূপভাবে ধারণা করে কথা বলাও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় ধারনা করে কথা বলা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা বিবিধ ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা কোন কোন ধারনা করা গুনাহের পর্যায়ে পড়ে।” [সূরা আলহুজুরাতঃ ১২] হাদীসে এসেছে, “তোমরা ধারনা করা থেকে বেঁচে থাক; কেননা ধারনা করে কথা বলা মিথ্যা কথা বলা।” [বুখারীঃ ৫১৪৩, মুসলিমঃ ২৫৬৩]

কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে এ আয়াতের দুটি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

এক. কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সম্পর্কে তার মালিককে প্রশ্ন করা হবে। প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? প্রশ্ন করা হবেঃ সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি শরীআত বিরোধী কাজ কর্ম করে থাকে, তবে এর জন্য সে ব্যক্তিকে আযাব ভোগ করতে হবে।

দুই. কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ সেগুলোকে প্রশ্ন করবেন। এটা হাশরের ময়দানে গুনাহগারদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছেঃ “আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের” [সূরা ইয়াসীনঃ ৬৫]। অনুরূপভাবে সূরা আন-নূরে এসেছে, “যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।[সূরা নূরঃ ২৪]।

وَ لَا تَمۡشِ فِی الۡاَرۡضِ مَرَحًا ۚ اِنَّکَ لَنۡ تَخۡرِقَ الۡاَرۡضَ وَ لَنۡ تَبۡلُغَ الۡجِبَالَ طُوۡلًا ﴿۳۷﴾

৩৭ ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।

অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর যুলুম না করে।’ [মুসলিমঃ ২৮৬৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, তোমাদের পূর্বেকার জাতিদের মধ্যে কোন এক লোক দুখানি চাদর নিয়ে গর্বভরে চলছিল। এমতাবস্থায় যমীন তাকে নিয়ে ধ্বসে গেল, সে এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে ঢুকতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৮৯, মুসলিমঃ ২০৮৮

অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে চলা আল্লাহর নিকট অতীব অপছন্দনীয়। এই অপরাধের কারণেই কারূনকে তার প্রাসাদ ও ধন-ভান্ডার সমেত যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। (সূরা কাসাস ৮১ আয়াত)

كُلُّ ذٰلِکَ کَانَ سَیِّئُهٗ عِنۡدَ رَبِّکَ مَكۡرُوۡهًا ﴿۳۸﴾

৩৮. এ সবের মধ্যে যা মন্দ তা আপনার রাবের কাছে ঘৃণ্য।

অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহর কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়। উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন- পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, আল্লাহর যে কোন হুকুম অমান্য করা অপছন্দনীয় কাজ। আয়াতে উল্লেখিত سيئُهُ বাক্য অন্য কেরা’আতে سيئة পড়া হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, এ সবগুলোই মন্দ কাজ। আল্লাহ এগুলো অপছন্দ করেন।

ذٰلِکَ مِمَّآ اَوۡحٰۤی اِلَیۡکَ رَبُّکَ مِنَ الۡحِکۡمَۃِ ؕ وَ لَا تَجۡعَلۡ مَعَ اللّٰہِ اِلٰـہًا اٰخَرَ فَتُلۡقٰی فِیۡ جَہَنَّمَ مَلُوۡمًا مَّدۡحُوۡرًا ﴿٣٩﴾

৩৯. আপনার রব ওহীর দ্বারা আপনাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলেও উদ্দেশ্য হলো তার উম্মত। কারণ তিনি শির্ক করার অনেক উর্ধ্বে। লক্ষণীয় যে, এ আদেশ, নিষেধ ও অসিয়তের শুরু হয়েছিল শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে। শেষ করা হলো আবার সেই শির্কের নিষেধাজ্ঞা দিয়েই। এর দ্বারা এটাই বোঝানো ও এ বিষয়ে তাকীদ দেয়া উদ্দেশ্য যে, দ্বীনের মূলই হচ্ছে শির্ক থেকে দূরে থাকা। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কেউ কেউ বলেন, প্রথম যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছিল তখন তার শাস্তি বলা হয়েছে যে, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে বসে পড়বে, অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা এভাবে সাহায্যহীন হয়ে থাকবে। তারপর সবশেষে যখন শির্ক থেকে নিষেধ করা হয়েছে তখন তার শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাহলে জাহান্নামে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এটা নিঃসন্দেহে আখেরাতে হবে।

اَفَاَصۡفٰکُمۡ رَبُّکُمۡ بِالۡبَنِیۡنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ اِنَاثًا ؕ اِنَّکُمۡ لَتَقُوۡلُوۡنَ قَوۡلًا عَظِیۡمًا ﴿۴۰﴾

৪০. তোমাদের রব কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে কি ফিরিশতাদেরকে কন্যারুপে গ্রহন করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয় ভয়ানক কথা বলে থাক।

এ আয়াতের সমার্থে আরো আয়াত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। যেমন, সূরা মারইয়ামঃ ৮৮–৯৫] এ আয়াতে কাফের মুশরিকদের মারাত্মক ভুল ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে, এতে করে তারা তিনটি ভুল করেছে। এক. আল্লাহর বান্দাদেরকে মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। দুই. তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে হওয়ার দাবী করেছে। তিন. তারপর তাদের ইবাদতও করেছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সমস্ত অযৌক্তিক ও মিথ্যা দাবী ও কর্মকাণ্ডকে খণ্ডন করে বলছেন, তোমরা কিভাবে এটা মনে করছ যে, যাবতীয় পুরুষ সন্তান তোমাদের জন্য রেখে তিনি তাঁর নিজের জন্য মেয়ে সন্তানগুলোকে নির্ধারণ করেছেন? তোমরা তো এক মারাত্মক কথা বলছি। নিজেদের জন্য অপছন্দ করে আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা কি যুলুম নয়?

তাফসীর সমাপ্ত

প্রস্তুতি সহায়ক এই নোট তৈরী করতে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাই-বোনের দারস/নোট, ইন্টারনেট থেকে তথ্য ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ প্রত্যকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

আমাদের এই নোটগুলোতে কোনো ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের জানাবেন ইনশাআল্লাহ।

ফুটনোট

* রিযিকের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা জায়েজ নেই।

* ব্যাভিচারের ধারে কাছে না যেতে বলা হয়েছে।

যিনার কুফল:
যিনা বা ব্যিভিচারের কারণে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিভিন্ন ধরণের কুফল বয়ে আনে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল:
(১) যিনাকারী বিভিন্ন ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়।
(২) ব্যিভিচারের কারণে যৌন সম্ভোগের বৈধ পথ রূদ্ধ হয়ে যায়; এর মাধ্যমে বিবাহ, পরিবার, সন্তানসন্ততির প্রতি মানুষের অবজ্ঞা সৃষ্টি হয়।
(৩) যিনা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যকার বিভেদ উঠায়ে দেয় এ শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ বলেন: "তারা খায় ও আনন্দ উপভোগ করে যেমন আনন্দ উপভোগ করে চতুষ্পদ জানোয়ার।" (সূরা : মুহাম্মদ ১২)
(৪) যিনাকারীর লজ্জা থাকে না।
(৫) মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থনীতিতে যিনা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যা যা করতে হবেঃ
১. যেনার উপসর্গ যেমন, প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, গায়র মাহরামের সাথে নির্জন বাস, পর্দা লংঘন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।
২. যেনার কারণে জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি হবে তা স্মরণ করা। লজ্জাস্থানের হেফাযতকারীকে জান্নাতের গ্যারন্টি দেওয়া হয়েছে
৩. একথা স্মরণ করা যে, আল্লাহ সব কিছুই দেখেন, আমার এ অবস্থাও তিনি দেখবেন এবং কোন মানুষ এখন না দেখলেও কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনে এটা প্রকাশ করে দেয়া হবে। তখন শরমের আন্ত থাকবে না।
৪. বিবাহ না করে থাকলে বিবাহ করা, না পারলে রোযা রাখা।
৫. যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে বা যে পরিবেশে যেনার সুযোগ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।
৬. যে সব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিংবা যা পড়লে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা যেনার মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকা।

* অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা।
* ইয়াতীমের সম্পদ না খাওয়া
* আর যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার অনুসরণ না করা বা সে বিষয়ে কথা না বলে; কারণ কিয়ামতের দিন কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে এবং এগুলো আমাদের বিরুদ্ধো সাক্ষ্য দিবে।
* সঠিক দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেয়ার সময় সঠিক মাপে দেওয়া
* অহংকার না করা এবং দাম্ভিকতার সাথে পদচারণ না করা